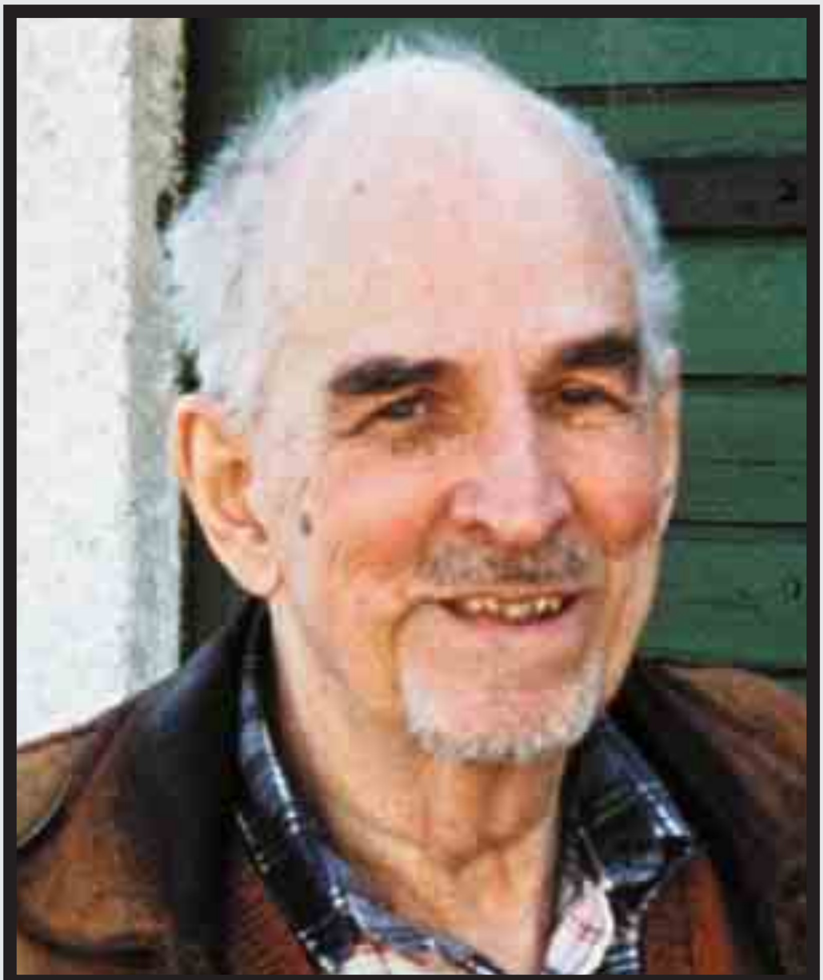

# ইঙ্গমার বার্গম্যান
## ফ্রেম থেকে ফেডআউট

ইঙ্গমার বার্গম্যান, আধুনিক চলচ্চিত্রের অন্যতম স্রষ্টা, মৃত্যুভয় যাঁকে তাড়িয়ে বেড়াতো, তিনি আর নেই। গত ৩০ জুলাই সত্যি সত্যি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তিনি।

আধুনিক চলচ্চিত্রে সবচেয়ে জটিল নামটি হলো, বার্গম্যান। তাঁর চলচ্চিত্র যেন দেখার নয়, দর্শনের। তাঁর চলচ্চিত্র দেখার পরে একজন দর্শক আক্রান্ত হবেন বিশ্লেষণহীন এক বোধের দ্বারা। অসংখ্য প্রশ্নের উদয় হবে মনে, কিন্তু কোনো উত্তর পাবে না। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে এটাই বলতে হয় যে, বাইরের বাস্তবতার সমস্যা নয়, বার্গম্যান ছবি বানাতেন মানুষের অস্তিত্বের অভ্যন্তরের সংকটকে ঘিরে। তাইতো বার্গম্যানের ছবির চরিত্রগুলো শেষ পর্যন্ত দর্শকদের কাছে পরিগণিত হয় জিজ্ঞাসার প্রতীক হিসেবে। সে জিজ্ঞাসার তর্জনী উত্তোলিত হয় কখনো ঈশ্বরের দিকে। কখনো মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্কের বিষয়ে জিজ্ঞাসায় আলোরিত হয় দর্শক-মন। কখনো মানুষের অস্তিত্বের বিকাশের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় যে অশুভ শক্তি— সেই শক্তি সম্পর্কে নানা প্রশ্নে জর্জরিত হয় দর্শক-চেতনা। ক্রমশ এক জিজ্ঞাসা থেকে আরেক গভীরতর জিজ্ঞাসার পথে ধাবিত হয় মন। বিপন্ন বিস্ময়ে ঘুরপাক খায় চেতনা। প্রয়াত কবি, চিত্রশিল্পী ও চলচ্চিত্রকার পূর্ণেন্দু পত্রীর ভাষায় তাই বলতে হয় 'নিজের জিজ্ঞাসা-জর্জর শিল্পে তিনি আমাদের জন্যে যা সাজিয়ে দিয়েছেন, তা এই পৃথিবীর ভেতরেই আরেক বিশাল পৃথিবী যেন।'

বার্গম্যানের ছবিতে আমরা মূর্ত হতে দেখি সময়, মৃত্যু চেতনা, আধুনিক মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণা, ঈশ্বরহীনতা .... । খ্রিস্টিয় বিশ্বাস বারবার তাঁর ছবিতে উঠে এসেছে। নারী, তাদের সমস্যা অনুভব, একান্ত পৃথিবীও বার্গম্যানের ছবির মুখ্য বিষয়।

বার্গম্যান জন্মগ্রহণ করেন ১৯১৮ সালের ১৪ জুলাই, সুইডেনের এক উপাসনালয়ে। বাবা ছিলেন এক যাজক। সামান্য দোষ পেলেই ছেলেকে শাস্তি দিতেন তিনি। বার্গমানের 'ফ্যানি অ্যান্ড আলেকজান্ডার' (১৯৮১) ছবিতে এক বিশপ তার ছেলেদের যেভাবে বেত দিয়ে পিটান, কড়া শাস্তি দেন, বার্গম্যানের শৈশবও ছিল সেরকম।

স্টকহোম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়, ১৯৩৮ সালে, প্রথম নাট্য নির্দেশনা দেন। সেই সময় শৌখিন নাটক করার পাশাপাশি বার্গম্যান অভিনয়ও করতে থাকেন বিভিন্ন সমসাময়িক এবং শেক্সপীয়র ও স্ট্রীন্ডবার্গের ধ্রুপদী নাটকগুলোতে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অস্থির সময়ে তরুণ বার্গম্যান বেশ ক'টি নাটক ও উপন্যাস রচনা করেন। এ সময়, লেখা ১৯৪৪ সালে তাঁর একটি স্ক্রিপ্ট অবলম্বনে ১৯৪৪ সালে পরিচালক আলফ স্যোবর্গ নির্মাণ করেন 'টরমেন্ট' নামক একটি সফল ছবি।

১৯৪৫ সালে বার্গম্যান আরেকটি স্ক্রিপ্ট তৈরি করেন এবং পরিচালনা করেন তাঁর প্রথম ছবি 'ক্রিসিস'। এ ছবির উপজীব্য বিষয় ছিল, বৈরী প্রাপ্তবয়স্ক সমাজে কিশোর ও তরুণদের সমস্যা। একই থিমকে বার্গম্যান বিচ্ছিন্নভাবে পরবর্তী আরো কয়েকটি ছবিতে কাজে লাগান। ১৯৪৮ সালে নির্মিত ছবি 'প্রিজন'-এ সর্বপ্রথম বার্গম্যান

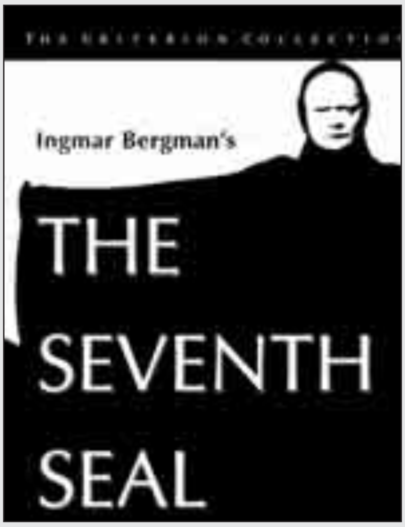

তাঁর কাহিনীর সামাজিক ও ব্যক্তিগত বাস্তবতা এবং নান্দনিক মাধ্যম, উভয়ের প্রতি তার দ্বৈত আগ্রহের পরিচয় দেন— সার্ত্রের 'নো এক্সিট' ও লুইসি পিরান দেল্লোর নাটকের প্রভাবে।

বার্গম্যানের পরবর্তী ছবিগুলোতে প্রাধান্য পায় নারীরা। তাদের জীবন ও অনুভূতির রহস্যকেই উন্মোচিত করতে চেয়েছে ছবিগুলো। পুরুষরা সেখানে কেবলই পর্যবেক্ষক কিংবা স্বেচ্ছা-সংশ্লিষ্ট অভিনেতা, কখনো চরিত্রের মতোই শূন্য ও অসমাপ্ত। উদাহরণ হিসেবে 'দি টাচ' ছবির কথা বলা যায়।

১৯৫০ সালে বার্গম্যান নির্মাণ করেন 'ইন্টারলুড' ছবিটি— যা চলচ্চিত্রকার হিসেবে বার্গম্যানের অপার সম্ভাবনাকে তুলে ধরে। ১৯৫৬ সালে বার্গম্যানের 'স্মাইলস অব এ সামার নাইট' ছবিটি কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ জুরি পুরস্কার লাভ করে। এরপর আর পেছন দিকে তাকাতে হয় নি বার্গম্যানকে।

বার্গম্যানের কালজয়ী একটি সৃষ্টি 'দি সেভেন্থ সীল'। এই ছবিটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে তিনি সুপরিচিত হয়ে ওঠেন, পুরস্কৃত হন। তিনি মহৎ চলচ্চিত্রকারদের সারিতে নিজের জায়গা করে নেন। বিষণ্ণ বাস্তবতাবাদী হিসেবে বার্গম্যানের ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল ও পোক্ত করে 'ওয়াইল্ড স্টবেরীজ' (১৯৫৭), 'দি ম্যাজিশিয়ান' (১৯৫৮) এবং 'দি ভার্জিন স্প্রীং', (১৯৬০) ছবিগুলো। তবে বার্গম্যানের পূর্বতম অস্তিত্ববাদী ও ধর্মীয় থিম অব্যাহত থাকে তাঁর ট্রিলজি 'থ্রু এ গ্লাস ডার্কলি' (১৯৬১), 'উইন্টার লাইট' (১৯৬৩) ও 'সাইলেন্স' (১৯৬৩)-এ।

বার্গম্যানের অন্যতম সেরা সৃষ্টি হচ্ছে 'পারসোনা' (১৯৬৬)। এ ছবিতে ঘটেছে মনোবিজ্ঞান ও নান্দনিক তত্ত্বে বার্গম্যানের দ্বৈত আগ্রহের এক অনন্য সংমিশ্রণ। ছবিটির চিন্তা বার্গম্যানের মাথায় আসে প্রিয় বন্ধু ডাক্তার স্টুর হেলান্ডার-এর বাড়িতে ডাক্তারের তোলা বিবি অ্যান্ডারসন ও লিভ উলম্যানের একটি স্লাইড দেখে। বার্গম্যানের মনে হয়েছিল, দুজনই যেন একই রকম দেখতে। দুটি নারীর এই একাত্মতাই 'পারসোনা'য় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

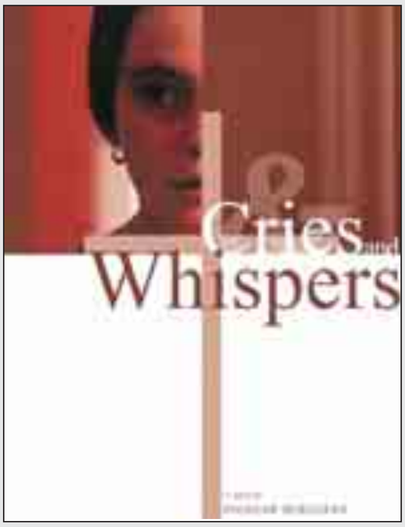


বার্গম্যানের 'আওয়ার অব দি উলফ' (১৯৬৮), 'শেম' (১৯৬৮), 'প্যাশন অব আনা' (১৯৬৯) এবং 'ক্রাইস অ্যান্ড হুইসপারস' (১৯৭৩)-এ উঠে এসেছে সমাজে শিল্পী ও ব্যক্তিক সম্পর্কের সংশ্লিষ্ট সমস্যা। 'সিনস অব ম্যারিজ' (১৯৭৪) ছবিতেও প্রচলিত সম্পর্কের সংকট বিশ্লেষিত হয়েছে। 'দি ম্যাজিক ফ্লুট' (১৯৭৫) একাধারে উভয় মাধ্যম সম্পর্কে এক উজ্জ্বল মন্তব্য, 'ফেস টু ফেস' (১৯৭৬) অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে এক মহিলা মনোবিজ্ঞানীর মানসিক বিপর্যয়।

বার্গম্যান বিয়ে করেছেন পাঁচবার। তাঁর 'ক্রাইস অ্যান্ড হুইসপারস'-এ কোনো না কোনোভাবে অংশ নিয়েছেন তাঁর প্রতিটি স্ত্রী। পঞ্চম স্ত্রী ইনগ্রিভ ছিলেন বার্গম্যানের সহকারী। তাছাড়া নায়িকা লিভ উম্যানের সঙ্গেও তার রোমান্টিক সম্পর্ক ছিল। বার্গম্যানের সন্তানও গর্ভে ধারণ করেছিলেন লিভ উলম্যান। আর এজন্য তিনি মোটেই লজ্জিত হন নি। বরং স্বগর্বে জানান দিয়েছিলেন— আমিই এটা ঘটতে দিয়েছি। এটা কোনো অন্যায় নয়। আমি খুশি।

বার্লিন সাগরের ফারো দ্বীপে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ইঙ্গমার বার্গম্যান। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

বার্গম্যানের নশ্বর দেহের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তাঁর 'দেহী'-র মৃত্যু নেই। সে অমর।

নিজের নির্মিত চলচ্চিত্রের মাঝেই চিরকাল বেঁচে থাকবেন বার্গম্যান।

■ মোমিন রহমান